প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

আমাদের গবেষণা সন্দর্ভ 'বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব'এর আলোচ্য বিষয় বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির কাহিনী। অর্থাৎ উপন্যাসের আবির্ভাবের প্রাক্ ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ইতিহাস। উপন্যাসের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির আলোচনায় উপন্যাস সংক্রান্ত তত্ত্বের অবতারণা প্রয়োজন। সেই সূত্র ধরেই প্রথম অধ্যায়ে নভেল অর্থে উপন্যাসের বহুমাত্রিক আলোচনায় প্রবেশ করছি।

এই বহুমাত্রিক তাত্ত্বিক আলোচনার আরম্ভেই উপন্যাসের শৈল্পিক সত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবো। বিশিষ্ট সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে এর সাধারণ লক্ষণগুলির আলোচনা করে বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করবো। উপন্যাস বাস্তব নির্ভর শিল্প, উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক অতি নিগূঢ় ও বহুমাত্রিক। ফলে উপন্যাসে বাস্তবতার অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হবে। উপন্যাস জীবন নির্ভর শিল্প বলেই তাতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে জীবনবীক্ষা। উপন্যাসে এই জীবনবীক্ষণ কিভাবে প্রতীয়মান হয় তা আলোচনা করা হবে। যুগ জীবন দ্বারা উপন্যাস কিভাবে কতটা প্রভাবিত হয় তা বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যবর্তী অন্তর্লীন দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের দিকে আলোকপাত করা হবে। সেই সঙ্গে উনিশ শতকের যুগ পরিবেশ উপন্যাসের ক্ষেত্র হিসেবে কতোটা সহায়ক হয়ে উঠেছে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের উপন্যাস ভাবনার পরিচয় ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হবে।

ক. উপন্যাসের স্বরূপ ও লক্ষণ

পাশ্চাত্ত্য নভেলের অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট শিল্পশৈলী রূপে উপন্যাস গড়ে উঠে। উপন্যাসের স্বরূপ নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই ।

এক সময় তাত্ত্বিকেরা উপন্যাসের স্বরূপ সংক্রান্ত যে কাঠামো তৈরি করেছেন, পরবর্তীকালের নূতন ঔপন্যাসিকেরা সে কাঠামোর গন্ডি অতিক্রম করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসই সবচেয়ে তরুণ, গতিশীল, আগ্রাসী এবং জনপ্রিয়।[১] আর সেজন্যই উপন্যাসের স্বরূপও পরিবর্তনশীল। প্রথম যুগে যে সব লক্ষণ দেখে কোনো কাহিনীকে উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, একালেও তার ব্যত্যয় নেই। তবে সে সব লক্ষণ ছাড়াও আরো নব নব লক্ষণ সমৃদ্ধ রচনা ও উপন্যাসের শিল্প গৌরব লাভ করছে। ফলে ধীরে ধীরে উপন্যাসের গন্ডিও হয়েছে সম্প্রসারিত।

ঔপন্যাসিক জীবনকে দেখেন গভীরভাবে। জীবনের বিচিত্রতা, গভীরতাকে তিনি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিবেশন করেন। সমস্ত শিল্পসৃষ্টির অন্যতম মৌলিক উপকরণ হ'লো জীবন। আর এই জীবনের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই উপন্যাস হ'লো জীবনের ও সমাজের দর্পণ। যে দর্পণে পরিবর্তনশীল সমাজের চলিষ্ণু মানবজীবনের বিভিন্ন সময়ের বিচিত্র ছবি প্রতিফলিত হয়।[২] বস্তুত উপন্যাস হ'লো এমন আখ্যান যাতে থাকে মানবজীবনের সুস্পষ্ট অখন্ডরূপের 'শিল্পিত বিন্যাস'; আর থাকে সমসাময়িক জীবনবোধ। অর্থাৎ সামগ্রিকতায় বিধৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা জীবনবোধ নিহিত থাকে উপন্যাসে। একটি বিশ্বাস্য কাহিনী, পরিচিত নরনারী, সমাজের বাস্তব সমস্যা এবং মানুষেরা হৃদয়-বেদনা যখন সংলাপ সমৃদ্ধ একটি পরিণত সুগঠন লাভ করে তখন তাকেই বলা হয় উপন্যাস।[৩]

উপন্যাস মূলত নরনারীর জীবন নির্ভর কাহিনী। সাধারণ নরনারীর ব্যক্তি চরিত্রই উপন্যাসের মধ্যে অসাধারণ ও মহিমান্বিত রূপলাভ করে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ব্যক্তিকে দেখি, উপন্যাসে রূপায়িত ব্যক্তির সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। বাইরের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা আমাদের চতুর্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ রূপে জানতে পারিনা। কিন্তু শক্তিমান লেখক ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেন। আর মানুষের অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে নিরুত্তাপ

জীবনযাত্রা নয়, নিরন্তর সংঘাতই উপন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সমকালের সমস্যা জর্জরিত সুস্থ জীবনপ্রবাহ থেকেই ঔপন্যাসিক জীবনের শিল্পরূপ দান করেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের এই ধ্যান ধারণার রূপকই হ'লো উপন্যাস। কাজেই সমকালের রাজনীতি-ধর্মনীতির দ্বন্দ্ব, আর্থিক সমস্যা, প্রেমচিন্তা, আদর্শ ও বাস্তবের অন্তর্বিরোধ সবই উপন্যাসের অন্তর্গত।[৪] অর্থাৎ উপন্যাস সর্বগ্রাহী। আর এই সর্বগ্রাহিতার ফলেই উপন্যাসের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় এক রকম দুঃসাধ্য।

উপন্যাসের মূল উপজীব্য হ'লো মানবচরিত্র। উপন্যাসে এই মানবচরিত্রকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য বিবিধ উপাদানের আবশ্যক। বিভিন্ন উপাদানের সার্থক সমন্বয়েই রচিত হয় উপন্যাস। উপন্যাসতত্ত্বের আলোচনায় উপন্যাসের শরীরী উপাদান(concrete elements) হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে প্লট, চরিত্র, দৃষ্টিকোণ, পশ্চাৎপট, সময় এবং ভাষা। লেখকের ভাবনা বা জীবন সম্পর্কিত ধারণাকে উপন্যাসতত্ত্বে অশরীরী উপাদান (abstract elements) রূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৫] এই উপাদানগুলো সম্পর্কে নীচে আলোচনা করছি।

উপন্যাস সৃষ্টির প্রথমযুগে গল্প (Story) এবং প্লট-এর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সে চেষ্টা পরবর্তীকালের। ফরস্টারই প্রথম যুক্তির সঙ্গে প্লট ও স্টোরির পার্থক্যের কথা বলেছেন।[৬] গল্পে সময়ের পথ ধরে কতগুলো ঘটনাকে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। আর প্লট হ'লো কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত কাহিনী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় —

গল্প : রাজাও মরলো। রাণীও মরলো।

প্লট : রাজা মরলো। তার দুঃখে রাণী মরলো।

উপন্যাস তাত্ত্বিকেরা আধুনিককালে উপন্যাসের উপাদানের মধ্যে চরিত্রকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবচরিত্রকে আবিষ্কার করা ও প্রকাশ করাই ঔপন্যাসিকের মূল

লক্ষ্য। ডব্লু·জে·হার্ভে চরিত্রকে শুধু একটি মানবরূপেই দেখেননি - তাকে সময়, ব্যক্তিত্ব, কার্যকারণ সম্বন্ধ, স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক আচার-আচরণ, নৈতিক ভাবনা, আবেগ এবং চিন্তা সব কিছুর সংমিশ্রণে দেখেছেন। এই ব্যাপকতর রূপে দেখার জন্য উপন্যাসের সামগ্রিক রূপের প্রকাশে যে সব উপাদান কাজ করে তাদের সকলের সঙ্গেই চরিত্রের যোগ প্রধান হয়ে দেখা যায়।[৭] চরিত্রের মাধ্যমেই উন্মোচিত হয় মানুষের অন্তর্জীবনের রহস্য। ফলে চরিত্রকে প্রধান উপাদান বললেও উপন্যাসের সমগ্র রূপটি ক্ষুন্ন হয় না।

দ্বন্দ্ব অভিঘাতে সমাজের অন্তঃস্তর চিরপরিবর্তনশীল। সমাজ যতো পরিবর্তিত হচ্ছে, চরিত্রের অন্তর্বৈশিষ্ট্যও ততো পরিবর্তিত হচ্ছে। চরিত্র পরিবর্তনের ফলেই উপন্যাসও চিরপরিবর্তনশীল, গতিশীল। তাই উপন্যাসকে অনড় সংজ্ঞা দিয়ে বা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে রাখাও সম্ভব নয়। ফলে উপন্যাস নিরন্তর এক সন্ধান। প্রত্যুত্তরমুখর, বিতর্কিত এবং বিরোধ সংঘাতেপূর্ণ।

ঔপন্যাসিককে মানবজীবনের গভীরে যেতে হয়। প্রয়োজনে অবচেতন মনের সন্ধানও নিতে হয়। সেজন্যই ঔপন্যাসিক এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেন না। সৃষ্ট-চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তাঁকে দৃষ্টিকোণ (point of view) পাল্টাতে হয়। দৃষ্টিকোণ তাই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপস্থাপিত কাহিনীকে পাঠকমনে সাফল্যের সঙ্গে সঞ্চারিত করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। লেখক কখনো নিজে প্রথম পুরুষ বা উত্তম-পুরুষের ভূমিকায় কাহিনী বিবৃত করেন। আবার কখনো কখনো সৃষ্ট চরিত্রকে প্রথমপুরুষ বা উত্তম পুরুষ রূপে উপস্থাপিত করে কাহিনী পরিবেশন করেন। ফলে ঔপন্যাসিক কখনো নিজের কথা, চিন্তা, চেতনা, উপলব্ধি ও অনুভূতিকে উপস্থাপিত কাহিনীর মাধ্যমে পাঠক-মনে সঞ্চালিত করেন। আবার কখনো বা সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে তা পরিবেশন করেন। উপন্যাস তাত্ত্বিকেরা উপস্থাপনার এই বিষয়গুলিকে দৃষ্টিকোণ (point of view) সম্পর্কিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রত্যেকটি উপন্যাসই পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য ও ভাবনার প্রকাশ। সেজন্যই দৃষ্টিকোণের বিচারে প্রতিটি উপন্যাসই স্বতন্ত্র।

উপন্যাসে স্থান বা পশ্চাৎপটকে উপন্যাস-তাত্ত্বিকেরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পশ্চাৎপট হচ্ছে পরিবেশ[৮](environment)। চরিত্রের ওপর পরিবেশের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। পরিবেশের প্রভাবেই ব্যক্তি-চরিত্রে নানা বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। ভৌগোলিক পরিবেশের বিচিত্রতার জন্য সামাজিক পরিবেশও স্বতন্ত্র হয়। এর ফলে ব্যক্তি চরিত্রেও পৃথক সত্তা উদ্দীপিত হয়। পশ্চাৎপট তাই ভৌগোলিক কিংবা সামাজিক কারণ রূপে ব্যক্তি-চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। আর এই ব্যক্তি-চরিত্রই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ফলে উপন্যাসের উপাদান স্বরূপ পশ্চাৎপটের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

✓ ঔপন্যাসিক রিচার্ডসন চরিত্রসৃষ্টির সহায়করূপেই সময়কে দেখেছেন। ফিল্ডিং পাঠকের কাছে ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করানোর জন্য সময়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। বারবুন্ড আবার বর্ণনপদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের দিকে লক্ষ করেই সময়কে দেখেছেন।[৯] প্রকৃত পক্ষে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কালসম্পর্কিত নিজস্ব একটা পরিবেশ আছে। বিষয়বস্তু লেখকের সমকালীন হ'তে পারে, লেখক পাঠকের অতীতকালীন হ'তে পারে, কিংবা তা ভাবীকালীনও হ'তে পারে। আবার নানাকারণে কালগত সংমিশ্রণও বিষয়বস্তুর পরিবেশে ঘটতে পারে। উপন্যাসে বর্ণিত অতীত ঘটনাবলী পাঠকের দৃষ্টিতে কাল্পনিক বর্তমানে রূপান্তরিত হয়। উপন্যাসে পাঠক, লেখক এবং বিষয়বস্তুর সময় সংকেত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সময়ের নিরিখেই নিরূপিত হয় মূল্যবোধ। সামাজিক দ্বন্দ্ব সংকট মানুষের ওপর যে সাক্ষ্য রাখে, ঔপন্যাসিক তার শৈল্পিক রূপ দেন চরিত্রের মাধ্যমে। সময়ের সাথে সাথে সমাজও পরিবর্তিত হয়। সমাজ ও মানুষের প্রকৃতি ভেদে উপন্যাসও হয় ভিন্নস্বাদের, ভিন্ন রূপের। সময়ের যে সংকট, মানুষের চেতনায় যে সংকটকে লেখক প্রত্যক্ষ করেন - তা তাঁর নিজ-কল্পনার আলোকে রূপায়িত করেন। লেখক দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন মূল্যবোধের আতসকাঁচে। তাই সব সংকটই তার চোখে ধরা পড়ে। আর সেজন্যই পাঠক সমাজ সমসাময়িক যুগের মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত হয়।

উপন্যাসে ভাব ও ভাষা হরিহর আত্মার মতোই অচ্ছেদ্য। উপন্যাসের ভাব বলতে বোঝায় জীবনের বিশিষ্টরূপের প্রকাশ। আর এই রূপ প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। উপন্যাসে বিভিন্ন উপাদানের সুসমন্বয়ও ঘটে ভাষার মাধ্যমে প্লটসৃষ্টি, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ - সবক্ষেত্রেই লেখকের প্রতীতিকে পরিস্ফুট করে তোলে ভাষা। উপন্যাসের ভাষাকে তাই হ'তে হয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুত বিভিন্ন উপাদানের সহায়তায় ভাষাকে অবলম্বন করেই ঔপন্যাসিক মানবহৃদয়কে পরিস্ফুট করেন। সমাজ ও ব্যক্তি-চরিত্রের পরিবর্তনের ফলে উপন্যাসের কথাবস্তুর বিষয়বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। আর কথাবস্তুর বিষয়বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষাকেও তার উপযোগী হতে হয়। দ্বন্দ্ব অভিঘাতে সমাজের অন্তস্তর পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাসের স্বরূপের পরিবর্তন যেমন ঘটেছে; তেমনি সেই বিশেষ পর্যায়ের উপন্যাসের ভাষারীতিরও সাজবদল ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এক সময়ে ঘটনাই ছিল উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে। কিন্তু পরে ঘটনার পরিবর্তে মনস্তত্ত্বই সে স্থান অধিকার করে। পারিবারিক জীবনের মনোরম আলেখ্যের পরিবর্তে ক্রমশ: বাস্তবতা-বাদী - আন্দোলন, আঞ্চলিকতা, মনস্তাত্ত্বিকতা গুরুত্ব পাওয়ার ফলে উপন্যাসের কথাবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিয়ত ভাষাও হয়ে উঠেছে তার উপযোগী।[১০] আবার একই ঔপন্যাসিক ভিন্নধর্মী উপন্যাসের প্রয়োজনে তাঁর গদ্যের রীতি পরিবর্তিত করেন। ফলে উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার আদলও পরিবর্তিত হয়। ভাষার যথাযথ প্রয়োগেই ভাবের সার্থক প্রকাশ ঘটে। আর ভাষা ও ভাবের সার্থক প্রকাশেই উপন্যাসের সার্থকতা।

মানবচরিত্রকে কেন্দ্র করে জীবন সম্পর্কে লেখকের ধারণা উপন্যাসে প্রকাশিত হয়। চরিত্র ও ঘটনাবলীর চেয়েও লেখকের জীবন সম্পর্কিত প্রতীতিই (conception) উপন্যাসে মুখ্য।[১১] ভাষার অবলম্বনে মানবহৃদয়কে উপন্যাসে পরিস্ফুট করা হলেও লেখকের জীবন সম্পর্কিত ধারণাকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাস যে জীবনের প্রতিফলন

তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। পরিচিত জগৎ ও মানুষের জীবনকথাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন।

> গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃতজীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা সংঘাতে তাহার চরিত্র স্ফুরণের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহ একটা আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা - ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।[১২]

আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

> ... নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনী থেকে দৃঢ়ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। ... সাহিত্যের নবপদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।[১৩]

ঔপন্যাসিকেরা শুধু যা ঘটে তাই চিত্রিত করেন না, যা ঘটতে পারে বা পারতো তারও ইঙ্গিত দেন। উপন্যাসের চরিত্রবিশেষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মনের কথা প্রকাশ করেন। উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে অলৌকিকতা, ও অতিমানবিকতা অবাঞ্ছিত। আত্মশক্তি নির্ভর, মানবচরিত্রই উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পীড়িত এই মানুষের সামগ্রিক পরিচয়, তার অন্তঃস্বরূপের উদ্‌ঘাটনই উপন্যাসের ধর্ম বা স্বরূপ।

✓ উপন্যাসকে যেমন অনড় সংজ্ঞায় বেঁধে দেওয়া যায়না, তেমনি একে গণ্ডিবদ্ধ করাও যায় না। তবুও যে বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে স্বীকৃত সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

১। উপন্যাস বর্ণনাত্মক গদ্যে রচিত একটি বিশেষ শ্রেণীর রূপায়ণ। গতানুগতিক ভাবে গল্প বলা নয়, নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত চরিত্রসৃষ্টিই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য।

২। উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রসমূহ কার্যকারণ পরম্পরায় অবিচ্ছিন্নরূপে গ্রথিত এবং একটি কেন্দ্রীয়ভাবনার অধীনস্থ। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত উল্লেখযোগ্য।[১৪]

৩। ব্যষ্টি ও সমষ্টির অন্তঃসংগ্রামের ফলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। সমস্যাসংকুল সমাজজীবনে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রয়াসের চিত্রই অঙ্কিত হয় উপন্যাসে। সমস্যার অস্তিত্ব এবং তা উত্তরণের প্রয়াস এ দুইই উপন্যাসে স্বীকৃত।

৪। নরনারীর জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণই উপন্যাসের উপজীব্য। জীবনরস সমৃদ্ধ কাহিনী-রচনাই উপন্যাসের মূলকথা।

৫। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান সুর— প্রণয়। এই প্রণয়কে কেন্দ্র করেই নরনারীর অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্ভাসিত হয়। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন প্রণয় লইয়াই নভেল লেখকদের কারবার।[১৫] রবীন্দ্রনাথও উপন্যাসে নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের রূপায়ণকে কাম্য মনে করেছেন। নরনারীর আঁতের কথাকেই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত করা হয়।

৬। উপন্যাসের কাহিনী সংঘটনের উপযুক্ত স্থান বা পটভূমি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ঔপন্যাসিককে নির্বাচন করে নিতে হয়।

৭। বিষয় এবং বক্তব্য অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে হয়।

৮। উপন্যাসের মূল বিশেষত্ব অন্বেষণে বিশিষ্ট সমালোচক বাস্তবতার ওপর জোর দিয়েছেন। উপন্যাসই জীবন, চরিত্র এবং সমাজের বাস্তবরূপকে সরাসরি এবং ব্যাপক ভাবে ধরে রাখে।[১৬] উপন্যাসের কথাবস্তু তাই সমসাময়িক জীবনভিত্তিক লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নির্ভর।

৯। উপন্যাস পাঠকমনে গল্পাতিরিক্ত আবেদন রাখে এবং এই আবেদন সহৃদয় পাঠকের জীবনবোধকে নাড়া দেয়।[১৭]

লেখকের জীবনানুভূতির প্রখরতায়, প্রগাঢ়তায় ব্যক্তিমানুষের 'মন' নামক সত্তাটিও প্রতিবিম্বিত হয়। চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার

আসল প্রকৃতি বা স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। চরিত্রের বাইরের আচরণ ও কার্যাবলীর পথ ধরেই ব্যক্তি-মনের গভীরে পৌছানো যায়। আর তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ব্যক্তি-র ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব মূল্যায়ন করা যায়। ফলে উপন্যাসের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য বাস্তবধর্মিতা শুধু রূপগত নয়, স্বভাবাতিরিক্ত বা ভাবগতও বটে। সামগ্রিক চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমেই এর রূপায়ন সম্ভব।

চরিত্রের সামগ্রিক রূপায়ণে কল্পনা প্রয়োজন স্বীকার্য। কিন্তু কল্পনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘিত হয়। এর ফলে উপন্যাসের মূলধর্মও ক্ষুন্ন হয়। কেবল প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সংবাদ হতে পারে, সাহিত্য নয়, উপন্যাসতো নয়ই। সংবাদ'এ লেখকের সমৃদ্ধ ভাবকল্পনা যখন যথার্থ রসসংস্কারে সক্ষম হয় তখনই তা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আর তা উপন্যাসেরও বিষয়বস্তু। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমস্যার অস্তিত্ব। আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যুগযন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের জীবন নানা প্রকার সমস্যার দ্বারা জর্জরিত। মানুষ নিরন্তর এই সমস্যার সমাধান প্রয়াসে লিপ্ত। সমস্যাকে এড়িয়ে নয়, তাকে মেনে নিয়ে, জয় করে আত্মরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মানুষের মহিমাকেই ঘোষণা করে। আধুনিক উপন্যাসে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আত্মিক - নানা সমস্যা লক্ষণীয়। আর এই সমস্যাকীর্ণ, দ্বন্দ্ববহুল জীবনচিত্রের রসসমৃদ্ধ প্রকাশই উপন্যাসের স্বভাব।

বিষয়বৈচিত্রের ফলে উপন্যাসও হয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর। শ্রেণীতত্ত্ব অনুসারে বাইরের এবং ভেতরের রূপানুসারে সাহিত্যকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।[১৮] বাইরের রূপ বলতে বোঝায় গঠনগত রূপ। ভেতরের রূপ বলতে বোঝায় উদ্দেশ্য, সুর ইত্যাদি।

সূচনাপর্ব থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত উপন্যাসের শ্রেণীতত্ত্ব নিয়ে তাত্ত্বিকদের পর্যালোচনা লক্ষ করলে দেখা যায় উপন্যাস ও রোমান্স (Novel and Romance) - এই

দুটি শ্রেণীই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। উপন্যাস হ'লো সমকালীন বাস্তব ঘটনা ও চরিত্র-ভিত্তিক কাহিনী। রোমান্স হ'লো কাল্পনিক, অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রভিত্তিক কাহিনী।

এডুইন ম্যুইর স্থান কাল প্রয়োগে আপেক্ষিক গুরুত্বের মাপকাঠিতে উপন্যাসের পাঁচটি গঠনগত শ্রেণীর কথা বলেছেন।[১১] এগুলো হ'লো —

১। কার্য বা ঘটনা প্রধান উপন্যাস।

২। চরিত্রপ্রধান উপন্যাস।

৩। নাট্যধর্মী উপন্যাস।

৪। ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস।

৫। বিশেষকাল বা যুগপ্রধান উপন্যাস।

আধুনিককালে উপন্যাসের বহুমাত্রিক বিভাজন লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক উপন্যাস ছাড়াও বিশুদ্ধ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসের শ্রেণীবিভাজন আরও বৈচিত্র্য-ময় হয়ে উঠেছে। যেমন : নানা আন্দোলনের উপন্যাস, শিক্ষক চরিত্র রূপায়ণের উপন্যাস, নাবিক জীবন নিয়ে উপন্যাস, ইত্যাদি। তাছাড়াও আঞ্চলিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাস, রহস্যোপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ভ্রমণোপন্যাস প্রভৃতি নানা শ্রেণী লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্তের উপন্যাসের শ্রেণী বিভাজন উল্লেখযোগ্য।[২০]

তবে শ্রেণী পরিচয় ব্যাপারটা চূড়ান্ত নয়। কেননা অনেক সময়ে একটি রচনাকে একাধিক শ্রেণীতে স্থান দিতে হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বেঁধে দিয়ে কোন উপন্যাসকে সর্বদা বিশেষভাবে পণ্ডিবদ্ধ করা চলে না। তাই শ্রেণী বিভাজনকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেননা সৃজনশীল লেখকের কল্পনা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন। তাই তা স্বভাবত যান্ত্রিকতার পরিপন্থী। অতএব শ্রেণী বিভাগকে সহায়ক হিসেবেই গ্রহণ করা কাম্য, অনড় আদর্শ রূপে নয়।

প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতাকেই রূপায়িত করেন উপন্যাসে। আর এই অভিজ্ঞতা অসীম এবং চির অপূর্ণ। তাই কয়েকটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্যে উপন্যাসের স্বরূপ ও লক্ষণকে বিশ্লিষ্ট করে দেখালেও এদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের সম্বন্ধই উপন্যাসের সাফল্যের ভিত্তি।

ক. উপন্যাস ও বাস্তবতা

উপন্যাস বাস্তবনির্ভর শিল্প। উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক তাই অতি নিগূঢ় ও বহু-মাত্রিক, উপন্যাস সমকালীন নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনকথা। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে মানবজীবনের সমস্যাবলী রূপায়িত হয় উপন্যাসে। এর ফলে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে জীবনবিচারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। জীবনরসসমৃদ্ধ গল্প রচনা উপন্যাসের মূল কথা হওয়ায় কোন লেখকই তার সমকালের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। ফলে লেখকের বাস্তবতাবোধ কালসীমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন লেখকের আবির্ভাব ঘটে। নূতন লেখক পরিবর্তিত সমাজবাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তারই শিল্পিত রূপ দেন উপন্যাসে।

উপন্যাস পরিচিত জগতের বাস্তব সত্যকেই মূর্ত করে তোলে। উপন্যাসে তাই সত্যের সুস্পষ্টতা ও কালগত নির্দিষ্টতা লক্ষণীয়। বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহ এবং সমাজ পরিবারস্থ ব্যক্তি চরিত্রই উপন্যাসের প্রাণসম্পদ। উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র ও ঘটনাবলী তাই অতীত বা বর্তমানের বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য সামাজিক চৈতন্যের প্রকাশ। দেশ কালের বিশিষ্টপটে জীবনের সমগ্রতাকে পরিস্ফুট করে উপন্যাস। ব্যক্তি মানুষের মাধ্যমে সমগ্র সমাজ, সমাজের সচলতা তার বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক সবদিককেই তুলে ধরে উপন্যাস। এদিক থেকে দেখলে মানুষকে অবলম্বন করে, সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামের মহাকাব্যিক রূপ উপন্যাস।[২১] আর মানুষ, মানবীয় সম্পর্ক ও সমাজ জীবনই উপন্যাসে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর জটিল হৃদয় বিশ্লেষনই জীবনায়নের মূলকথা। আর তা হবে বিশ্বাস্য। আরোপিত কৃত্রিমতা বা আকস্মিকতা উপন্যাসের সহজ বাস্তবতা কে ক্ষুন্ন করে। উপন্যাসের উপাদান সমূহের সামঞ্জস্য ও ঐক্যের উপর উপন্যাসের বাস্তবতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিকের মনে ঐক্য চেতনার অভাব থেকে দেখা দেয় ঘটনা ও চরিত্রের অসংলগ্নতা ও অসামাঞ্জস্যতা। সহজ সাবলীল ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে অতি নাটকীয় অবাস্তব ঘটনার প্রাদুর্ভাব শিল্পধর্ম নষ্ট করে।[২২] আসলে প্রতিদিনের সুপরিচিত সহজ সত্যকে অসামান্য ও চিরদিনের সত্যরূপে সৃষ্টি করেন প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক। উপন্যাস তাই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উপন্যাসের উপাদান সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নে লেখকের পরিমিতিবোধ কাজ করে। এই পরিমিতিবোধের ফলে উপন্যাসে প্রাণধর্ম ফুটে উঠে, রূপায়িত হয় জীবনের বাস্তবতা। এই বাস্তবতার গুণেই উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রাবলী আমাদের কাছের মনে হয়। আমাদের চেনা মানুষের, জানা প্রাণের কথা মনে হয়। এই বাস্তবতার গুণেই উপন্যাস অনন্ত ভবিষ্যৎময় একটি শিল্পরূপ।[২৩] ফলে উপন্যাসিককে সমাজ সংসারের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। মানবিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধ নির্ণয়ে বাস্তববোধের রূপায়ণের উপর উপন্যাসের সাফল্য নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিই এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল।

সাহিত্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। জীবন ও সাহিত্য কোনটাই কালনিরপেক্ষ নয়। কালের গতির সঙ্গে জীবনও গতিশীল। এর ফলেজীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তনশীল। সমাজের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির চরিত্র লেখকের মূল্যবোধের দৃষ্টিতে উপন্যাসে রূপায়িত হয়। উপন্যাসে তাই আমরা পাই সমকালীন মানুষ এবং সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের পরিচয়। তবে তা লেখকের তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে উপন্যাসে রূপায়িত হয়। ফলে লেখকের বাস্তবতাবোধের পরিমিতির উপরে সমাজ এবং ব্যক্তির যথার্থ রূপায়ন

নির্ভরশীল।

> নভেল অর্থে উপন্যাসের অপরিহার্য শর্ত হল জীবনের সত্যতা। তার জন্য তথ্যে লগ্ন থাকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তথ্যের দ্বারা গ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। উপন্যাসের অপরিহার্য শর্ত মর্মগত বাস্তবতা।[২৪]

উপন্যাসে মানুষের সহস্র সম্পর্কের সূত্রগুলিকে উদ্ঘাটিত করে দেখানো সম্ভব। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপন্যাসিকের উপলব্ধি করে বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়। ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান মূলত তাঁর সময়জ্ঞান, সমাজ জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান, ব্যক্তিমানসের জ্ঞান - এই সমস্তের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। উপন্যাস তাই বাস্তবের রূপায়ণ।

বাস্তবতা নিয়ে সাহিত্যে তথা উপন্যাসে বহু বিতর্ক থাকলেও, সার্থক উপন্যাসের রূপায়ণে এই বোধটির অপরিসীম গুরুত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয়। এই বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তববোধের ফলেই ঔপন্যাসিক জীবনের নিটোল রূপ প্রকাশে সক্ষম। কোন কোন উপন্যাস তাত্ত্বিক আবার ঔপন্যাসিকের এই প্রকাশ ক্ষমতাকে লেখকের জীবন দর্শন বা জীবনদৃষ্টি নামেও অভিহিত করেন। প্রসঙ্গত এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করছি।

লেখকের বাস্তবতাবোধের নিরিখে যেমন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মর্যাদা নিরূপিত হয়, তেমনি লেখকের জীবনদৃষ্টিরও প্রতিফলন হয়। বাস্তবতাবোধের সঙ্গে লেখকের জীবনদর্শণ মিলিত হয়েই সমাজ ও সমাজ বিধৃত মানুষ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়। উপন্যাস তাই জীবনবোধক হয়ে ওঠে এবং জীবনের সামগ্রিকরূপও তাতে উদ্ঘাটিত হয়। কবিতায় মানুষের ভাবজগতের প্রকাশ ঘটে। নাটকে ইচ্ছা ও কর্মের ঘাত প্রতিঘাতের বিভিন্নমুখী বিচিত্র চেষ্টার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু উপন্যাসে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের 'জীবন্ত সাক্ষাৎ' মেলে। ঔপন্যাসিক মানুষকে, মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেন। এর ফলে তিনি যেমন আবিষ্কার করেন, তেমনি কল্পনার সাহায্যে অনেকখানি সৃষ্টিও করেন, নির্মানও করেন। ঔপন্যাসিকের এই কল্পনার সঙ্গে তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি - প্রভৃতি ক্রিয়াশীল। এগুলো যেমন ঔপন্যাসিকের নিজস্ব, তেমনি অনেকটা আবার সামাজিক পরিমণ্ডলেরও দান।

ঔপন্যাসিকের মনে মানুষ সম্পর্কিত ধারণার দ্বারা নির্মাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধারণা স্পষ্ট-অস্পষ্ট, সুগঠিত, সুবিন্যস্ত কিংবা অগঠিত বা অবিন্যস্তরূপে কোথাও কোথাও লক্ষণীয়। সুস্পষ্ট ও সুগঠিত হ'লে যেমন অনায়াসে বলা যায় তা লেখকের জীবন-দর্শনের অঙ্গ, তেমনি অস্পষ্ট বা অবিন্যস্ত হ'লে তা বলতে অসুবিধা হয়। তবে এই স্পষ্টতা, অস্পষ্টতার যোগ মূলত লেখকের জীবনদর্শনের সঙ্গেই নিহিত। সীমিত অর্থে সব ঔপন্যাসিকই মানবজীবনের দার্শনিক। যদিও তাঁর প্রকাশ মাধ্যম শিল্পের ভাষায়, দর্শনের ভাষায় নয়। কোন ভাষায় প্রকাশিত হ'লো তা অবশ্য মোটেই অবহেলা করার মতো নয়, তবু সাময়িকভাবে প্রকাশের কথাটাকে বিস্মৃত হলে ঔপন্যাসিককে দার্শনিকও বলা যায়।[২৫]

জীবনকে আশ্রয় করাই উপন্যাসের ধর্ম। উপন্যাস তাই জীবনেরই সাহিত্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টির টানাপোড়েনেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক সত্তার ব্যক্তি। চরিত্রের অন্ত-সংগ্রামের মাধ্যমে জীবনসত্যের উদ্‌ঘাটন হয়। উপন্যাস তাই ঘটনা, চরিত্র আর সংলাপের সংযোজন মাত্র নয়। এতে থাকে শিল্পীর জীবনদর্শন। আর তা উপন্যাসের অন্য সমস্ত উপাদানের নিয়ন্তা।[২৬] উপন্যাসে জীবনবিন্যাস ঔপন্যাসিকের মানস বিধৃত। লেখকের জীবনানুভূতির মাধ্যমে উচ্চারিত হয় জীবন জিজ্ঞাসা। আর এর মধ্যেই উপন্যাসের শিল্পগৌরব নিহিত। গূঢ় জীবন-জিজ্ঞাসা। আর এর মধ্যেই উপন্যাসের শিল্পগৌরব নিহিত। গূঢ় জীবন জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হলে কোনো উপন্যাসই মহৎ-মহিমা লাভ করেনা।[২৭] সুতরাং সুনিশ্চিত জীবন জিজ্ঞাসা, সমাজ-সচেতনতা আর বাস্তববোধ উপন্যাসকে কালজয়ী করে তোলে।

ঔপন্যাসিক জীবনের ভাষ্যকার। এই জীবন বাস্তব জগৎ থেকে আহৃত। উপন্যাস তাই সমাজ প্রেক্ষিতের গভীর দ্যোতনাবহ। লেখকের জীবনদর্শন শক্তির টানে ও গভীরতায় ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, সমালোচনা প্রভৃতি সংহত রূপ লাভ করে সৃষ্টিশীল ঐক্য গড়ে তোলে। লেখকের জীবন সম্পর্কিত ভাবনা সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় —

> ঔপন্যাসিক যখন লেখেন, তখন তিনি যে শুধু সাধারণভাবে একটি আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক মানুষ রচনা করেন তা নয়, তিনি আপন সত্তারই একটি অন্তর্নিহিত ভাষ্য (implied version) রচনা করেন।[২৮]

তবে তা কোথাও জীবনের বহিরঙ্গের বর্ণনা, আবার কোথাও অন্তরঙ্গের বিশ্লেষণ।

উপন্যাসের বড়ো কথা মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধও লেখকের জীবন দর্শণের উপর নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিক মূল্যবোধের আতসকাঁচে দৃষ্টি দিয়ে সমকাল, ভাবীকালকে প্রত্যক্ষ করেন। এর ফলে তিনি মূল্যবোধ সম্পর্কে নীরব থাকতে পারেননা। এই দৃষ্টি লেখকের 'দ্বিতীয় সত্তা'নামেও অভিহিত। লেখকের এই সত্তাই সহজাতবোধের দ্বারা চরিত্রের আবেগ, দুঃখ বেদনার সঙ্গে জড়িত। তাই ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে লেখকের জীবন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার বিন্যাস দ্বারাই তাঁর জীবন-দর্শন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সাহিত্য সমাজ-মনের ভাষাগত প্রকাশ। সমাজের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। স্রষ্টাও সামাজিক মানুষ হিসেবে আপন ভাবনানুযায়ী কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করেন। কেননা স্রষ্টার কাছে পক্ষপাতিত্বহীন জগৎ অসম্ভব কল্পনা।[২৯] মহৎ স্রষ্টা আপন শ্রেণীর মধ্যে অবস্থান করেও অন্যায় অবিচারের মুখোশ খুলে দেন। সমাজমানসের গভীরে প্রবেশ করে সত্যের নগ্নমূর্তি উদ্‌ঘাটন করেন। ফলে সমকালীন মানুষ ও সমাজের প্রতিবিম্ব উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। বস্তুত সমকালকে বাদ দিয়ে উপন্যাসের সার্থকতাও থাকেনা। তবে মহৎ স্রষ্টা সমকালের বর্ণনার মাধ্যমে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করেন। যুগচেতনা ও যুগবৈশিষ্ট্য তাই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা উপন্যাসে প্রতিফলিত যুগজীবন ও যুগচেতনা নিয়ে আলোচনা করবো।

116356
29 APR 1997
University Library

গ. উপন্যাস ও যুগজীবন

মানব চরিত্র যুগনিরপেক্ষ নয়। যুগবৈশিষ্ট্য সমকালীন সমাজ মননের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। ঔপন্যাসিক তার সামগ্রিক দৃষ্টিতে সেসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবনেরই প্রতিফলন করেন তাঁর শিল্পে। ফলে যুগচেতনা তথা যুগজীবন ও উপন্যাসের সম্পর্ক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেই উপন্যাস সাহিত্য হিসেবে এতো জনপ্রিয়। উপন্যাস সামাজিক বিবরণ কিংবা সমাজের ইতিহাস নহে - সামাজিক নরনারীর সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তি-মাত্র।[৩০] ক্রমবিকাশের ধারানুসরণ করে সমাজ অগ্রসর হ'তে থাকে। উপন্যাসেও সে অনুযায়ী জীবনের আদর্শ পরিবর্তিত হ'তে থাকে। উপন্যাস তাই যুগসত্যকে প্রকাশ করে। আর তা উপন্যাসকে তাৎপর্যপূর্ণ একটি নূতন যাত্রা দান করে। এই নূতনযাত্রা উপন্যাসের ধর্মকেই সমৃদ্ধ করে।

যুগসত্য দেশকালের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সব শিল্পেই কালের সত্য ও কালাতীত সত্য - এ দুইই মিশে একাকার হয়ে থাকে। তবুও তুলনায় উপন্যাসে কালের সত্য অনেকটা ব্যাপক। কিন্তু ব্যাপক হ'লেও উপন্যাসেও এ দুই সত্য সমন্বিত ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। কেননা,

> যে উপন্যাস চিরকালের লোভে নিজের কালকে হারায়, সে আর যাই হোক উপন্যাস হয় না - উপন্যাসের চেহারায় কাব্য হতে পারে, দর্শন হতে পারে, থিওলজি হতে পারে, উপন্যাস হয়না। অন্যদিকে যে উপন্যাস সমকালের লোভে চিরকালকে হারায়, সে সংবাদপত্র হতে পারে, সমাজতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক প্রবন্ধ হতে পারে, কিন্তু শিল্প হতে পারেনা।[৩১]

সমালোচকের মন্তব্য থেকেও প্রতীয়মান হয় মানুষের চিরকালীন সত্য আর মানুষের নিজের কালের সত্য দুইই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাস তাই এমন দর্পণ যা দ্রুতধাবমানকালের দ্রুতপরিবর্তনশীল মুখের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছবিকে প্রতিফলিত করে। উপন্যাস সমাজ মধ্যগত মানুষের কথা বলেই যে কোনো শিল্পের তুলনায় উপন্যাসের সঙ্গে সমাজের যোগ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। কালের বদলের সঙ্গে ঘটে মনের বদল, সে সঙ্গে ঘটে রুচির বদল।

সমাজ জীবনের শত সহস্র জটিল ঘাত সংঘাত আর দ্বন্দ্ব বিক্ষোভে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি সাড়া দেয়। ফলে সমাজ ব্যতীত মানুষের এই পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক যুগের সমাজেই কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাই সাহিত্যের মূল্যায়ণে সমাকলীন যুগপরিবেশ - সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিকে অনুধাবন করা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য —

> নিত্য নব সমস্যার আর্বিভাবের সঙ্গে নূতনতর প্রতিভার উন্মেষ, শক্তির প্রকাশ, সমস্যায় আর শক্তিতে সংগ্রাম, সমস্যার প্রতিভূ প্রকৃতির পরাজয় আর শক্তির প্রতিভূ মানুষের জয়, - এই হলো মানুষের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস ··· ···।[৩২]

তাই সাহিত্যের তথা উপন্যাসের সত্য হ'লো যুগসত্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে এই আত্মীয়তাবোধ বা জীবনবোধ গড়ে ওঠে। ফলে উপন্যাস সৃষ্টির মূলে যুগচেতনার ভূমিকাও সক্রিয়। মহৎ স্রষ্টা সমকালের বর্ণনার মাধ্যমে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করেন। পাঠককে সমকাল সম্পর্কে যেমন অবহিত করেন, তেমনি ভাবীকালেরও ইঙ্গিত দেন।

ঘ. উপন্যাস ও আঙ্গিকের সম্পর্ক

উপন্যাসের উপাদানসমূহের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পর্কিত ভাবনার সমন্বয়ে উপন্যাস রূপ লাভ করে। তবে উপন্যাসের সার্থকতা সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর। প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যম হ'লো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মনের ত্রিয়ার অবয়ব সৃষ্টিই ঔপন্যাসিকের কাজ। উপন্যাসের একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা শিল্পরূপ আছে। উপন্যাসের আঙ্গিক সংক্রান্ত বিচার বিশ্লেষণের জন্য তিনটি দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।[৩৩] প্রথমতঃ আখ্যান ভাগ, দ্বিতীয়তঃ চরিত্রচিত্রায়ণ এবং পরিবেশন রীতি (method of communication)। এই তিনের সুষ্ঠু সমন্বয়েই উপন্যাস শিল্প সুষমা লাভ করে।

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসেবে একটি কাহিনী পরিকল্পনা করেন। কাহিনীকে তিনি কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত করে প্লট সৃষ্টি করেন। লেখক গল্পরসের পরিবেশক। পরিবেশনের আধারটিকে বলা যায় ফর্ম। আর তিনি যে ঢং-এ পরিবেশন করেন সেটি হ'লো লেখকের স্টাইল। স্টাইল লেখকের স্বকীয়তা ও বিশেষত্বের প্রতীক। গল্প-রস বা কাহিনী পরিবেশনের আধারকে বলা হয় শিল্পশৈলী। উপন্যাসের শিল্প নির্মিতির বিচারে তা হ'লো প্লটসৃষ্টি। প্লটই তাই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। প্রকৃতি অনুযায়ী প্লটের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ লক্ষণীয়। যথা, সরলপ্লট, জটিল প্লট এবং যৌগিক প্লট। সরল প্লট বলতে বোঝায় যে প্লটে একটিই কাহিনী বা আখ্যান থাকে, শাখা কাহিনী বা উপকাহিনী জটিলতার সৃষ্টি করেনা। জটিল প্লটে মূলকাহিনী একটি থাকে। কিন্তু বেশ কিছু উপকাহিনী উপন্যাসের আখ্যান অংশকে বিস্তৃত ও জটিল করে তোলে। অবশ্য মূলকাহিনীর পরিপূরক হিসেবেই উপ-কাহিনীগুলির উপস্থাপনা। যৌগিক প্লটেও কাহিনী থাকে একাধিক। তবে জটিল প্লটের মতো একটি কাহিনী প্রধান হয়ে না উঠে, প্রত্যেকটিই তাৎপর্যপূর্ণ হয়। প্লট গ্রন্থনের সঙ্গে লেখকের রচনারীতির সম্পর্ক তাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উপন্যাসের অন্তরঙ্গ গ্রন্থন প্লট নির্মিতির উপর নির্ভরশীল।

উপন্যাসে উপস্থাপন রীতির বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে লেখকের সমগ্র জীবনবোধের পরিচয় প্রতিফলিত হয় বলে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন।[৩৪] ফলে উপন্যাসে নির্বাচিত রীতির ভূমিকা অসামান্য। উপন্যাস সৃষ্টির কয়েকটি বহিরঙ্গ রীতি আছে। যদিও রীতির ব্যবহারে লেখকের স্বাধীন ইচ্ছাই ক্রিয়াশীল।[৩৫] তবে উপন্যাস রচনার প্রচলিত পদ্ধতি বা সাধারণ বহিরঙ্গ রীতি প্রথম পুরুষে কাহিনীর বর্ণনা। এই রীতিতে লেখক কোন ভূমিকা আশ্রয় না করে সংঘটিত ঘটনা এবং ক্রিয়াশীল চরিত্রের বর্ণনা করে যান। অর্থাৎ চরিত্রগুলো যেভাবে ঘটনার সম্মুখীন হয়, তাদের প্রতিক্রিয়া, কার্যধারা, চরিত্রের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত - এসবই তাদের জবানীতেই ঔপন্যাসিক শুনিয়ে থাকেন।

উপন্যাসে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হ'লো উত্তম পুরুষে রচিত কাহিনী। এই রীতিকে আত্মকথনমূলক বা autobiographical রীতিও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে আমির জবান বন্দির ঢং-এ কাহিনী গুথিত হয়। এই আমি কখনো স্বয়ং ঔপন্যাসিক হতে পারেন, আবার কখনো উপন্যাসের কোন প্রধানচরিত্রও হ'তে পারে। ইংরেজি সাহিত্যে এটি 'First person novel'- হিসেবে জনপ্রিয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক ঔপন্যাসিকেরাও এই রীতিকে অবলম্বন করেছেন। এই রীতিতে রচিত উপন্যাস এক ব্যক্তির ধ্যান ধারণায় বিধৃত হওয়ায় এক জাতীয় সংবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ অর্থে ঔপন্যাসিকও তাঁর দায়িত্ববোধ সীমিত করে নেবার অবকাশ পান। উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তর্লোক বিশ্লেষণের অবকাশ এই পদ্ধতিতে নেই। আখ্যান কথনের জন্য নির্বাচিত চরিত্রের জবানবন্দির সূত্রে অন্য চরিত্রগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়। কথক বাহ্য জগতের আর অপরের মানসিকতার যতটুকু পরিচয় বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে পেতে পারে, পাঠকও সেটুকুই জানতে পারে। ফলে অনেক সময় সে জানা সামগ্রিক না-ও হ'তে পারে। এই খন্ডিত দৃষ্টির ফলে উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকতা বা অখন্ডতা এই রীতিতে ক্ষুন্ন হ'তে পারে।

উপন্যাসের উপস্থাপনায় চরিত্র কথনমূলক রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রীতিতে উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান চরিত্র পর্যায়ক্রমে কাহিনী অংশ বিবৃত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' থেকে সাম্প্রতিককালেও অনেক সার্থক উপন্যাস এই রীতিতে রচিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রধান চরিত্রগুলির মনের কথা তাদের নিজের জবানীতে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে। কিন্তু যে চরিত্রগুলি যখন বিবরণ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে তারা ততোটাই বিবরণ দিতে পারে যতটুকু তাদের পক্ষে অনুভব করা বা জানা সম্ভব। এর বেশী কিছু তার কাছ থেকে প্রকাশিত হ'লে উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাবে। ফলে ঔপন্যাসিককে সদা সতর্ক থাকতে হয়। তাছাড়া কাহিনীর কোন অংশ কোন চরিত্র বর্ণনা করবে সে সম্বন্ধেও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন। এ ধরণের আঙ্গিক ব্যবহারে ঔপন্যাসিককে তাই সচেতন থাকতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পত্রাকারে উপন্যাস রচনা বা দলিল দস্তাবেদের মাধ্যমে উপন্যাসের বিচিত্র আঙ্গিক গড়ে তোলার রীতিও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রাকারে ঠিক উপন্যাস রচনা করেননি, তবে কৌশলে উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার করেছেন। যার ফলে মূলকাহিনী পরিণতিতে পৌছানোর মতো অবকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

ক্রমশ বহির্জীবনকে পরিত্যাগ করে ঔপন্যাসিক অন্তর্জীবনের অভিমুখী হয়েছেন। এর ফলে তাঁর বাস্তবচিন্তাও পালটে গেছে অনিবার্যভাবে। এই বাস্তবতার সিদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে শব্দের অর্থ বহন ক্ষমতার উপর। মানুষের অফুরন্ত প্রাণময় অনুভূতিই বাস্তব। এই অনুভূতিময় বাস্তবতাকে প্রকাশ করার জন্য ঔপন্যাসিক চরিত্রের অন্তর্নিহিত গভীর সত্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী। এর ফলে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিক ও পাঠক উভয়ের চিত্তেই আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যে সূচিত হয়েছে নবপর্যায়ের পদ্ধতি। 'আঁতের কথা' বের করে দেখানোই এই পদ্ধতির মূলকথা। মানব মনের বাধাবন্ধনহীন, অযৌক্তিক এমনকি অস্বাভাবিক গতি প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিককে চেতনাপ্রবাহ রীতিকে গ্রহণ করতে হয়।[৩৬] আধুনিক উপন্যাসের অনিবার্যগতি স্বাভাবিক ভাবেই তাই চেতনা প্রবাহ পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছে।

ঔপন্যাসিকের নির্বাচিত রীতির সঙ্গে স্থান ও কালের সার্থক প্রয়োগে উপন্যাসকে জীবিতকল্প করে তোলে। ঔপন্যাসিকের বাস্তবাগ্রহ তাতে পরিস্ফুট হয়। ফলে পটভূমি নির্বাচনের দ্বারা বা তার ব্যবহারের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের শিল্প চাতুর্য ফুটে উঠে। পরিবেশ ও পটভূমির উপযুক্ত বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রগুলির মানসিক উত্থান-পতনের চিত্র লেখক স্পষ্ট করে তোলেন। মূল্যবোধ ঔপন্যাসিকের কাছে প্রধান হওয়ায় পরিমিতিবোধ সম্পর্কে ও লেখককে সচেতন থাকতে হয়। এই পরিমিতিবোধের ফলেই ঔপন্যাসিক সময়ের নির্দিষ্টতা সম্পর্কে অবহিত থাকেন। কালের বর্ণনায়, সময়ের বিস্তারে লেখক তাই নানা কৌশল অবলম্বন করেন। বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় কৌশল অতীতচারিতা বা 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক'। এছাড়া ভবিষ্যৎচারিতা' পদ্ধতিও

সাম্প্রতিক কালে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে লেখক বর্ণনীয় কাহিনী অংশ থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণ অবস্থায় আবার বর্তমানে ফিরে আসেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার সময়ের ব্যবহার অর্থাৎ যাকে বলা যায় সময়ের অতিপাত বা 'passage of time'-এর বিন্যাসক্রমের দ্বারা উপন্যাসের শিল্প মাধুর্য বৃদ্ধি করাই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। বলাবাহুল্য উপন্যাসের শিল্পসৌধ সৃষ্টিতে, সমস্ত উপাদানের সুসমন্বয়ের মূলে রয়েছে ভাষা।

ভাষার প্রয়োগে কোন ঔপন্যাসিক তথ্যনিষ্ঠ, কোন ঔপন্যাসিক মানবধর্মী, কেউ আবার অলংকারময় কাব্যিক প্রকাশের পক্ষপাতী। আসলে স্রষ্টা তাঁর নিজস্ব বাক্‌শৈলী বা 'স্টাইল' গড়ে তুলে বহু ব্যবহৃত ভাষার নূতনতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চান। উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে ভাষার গুরুত্ব তাই অপরিসীম। বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যকে উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করতে চান ঔপন্যাসিক। বিষয় এবং বক্তব্য অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা থাকে ঔপন্যাসিকের। বিষয়বস্তু এবং তার পরিবেশনের নৈপুণ্যের পার্থক্যেই কখনো তা হয় ছোটগল্প, কখনো বড়োগল্প, কখনো রোমান্স, কখনো উপন্যাস। বিষয়বস্তু বা গল্পরস পরিবেশনের আধারই হ'লো শিল্পশৈলী।

উপন্যাসের শিল্পশৈলীর বিচারে প্লটই হ'লো এই আধার। তাই অন্তরঙ্গ গ্রন্থনরীতির গুরুত্বও সমধিক। ফলে শুধু বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ নয়-এই দুয়ের সমন্বয়েই উপন্যাসের শিল্পশৈলী বা আঙ্গিক।

৩. বাংলা উপন্যাস ভাবনার উদ্ভব : বিশিষ্ট সংজ্ঞার্থে

উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে কাহিনী অর্থেই উপন্যাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের ফর্মগত শিল্পসত্তা বলতে যা বোঝায় প্রথম পর্বের কাহিনীতে এরূপ সত্তার উন্মোচন ঘটেনি। বাংলা কথাসাহিত্যে 'উপন্যাস' শব্দটির প্রথম ব্যবহার ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ করি। নীলমণি

রসাক 'Arabian Nights Tales' -এর গদ্যানুবাদের নামকরণ করেন 'আরব্য উপন্যাস'(১৮৫৬)। এই দুই ক্ষেত্রে আরব ও পারস্য দেশের কাহিনী বা উপাখ্যান অর্থেই উপন্যাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'উপন্যাস' শব্দটি ধীরে ধীরে একটি শিল্প গৌরব লাভ করে এবং নভেল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'উপন্যাস' শব্দটি নভেল অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও, নভেল অর্থে উপন্যাসের উদ্ভবে বিলম্ব ঘটেছে। এর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত চলেছে উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুতির ইতিহাস।

বস্তুত ,উপন্যাস হ'লো আধুনিক সমাজ-মননের শৈল্পিক প্রতিচ্ছবি। উপন্যাস ভাবনার উদ্ভবের সঙ্গে সমাজ মননের উত্তরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রাক্ আধুনিক যুগে এই দুয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলেই বাংলা উপন্যাসের বিলম্বে উদ্ভবের কারণ জানা যায়।

বর্ণ-শাসিত মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ নানা বাধা নিষেধের বেড়া জালে পদে পদে আবদ্ধ ছিল। সতীদাহ প্রথা, গৌরীদান প্রথা তথা বাল্যবিবাহ, কৌলীণ্যপ্রথা তথা বহুবিবাহ, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক কাজকর্মে নরনারীর সীমিত যুগ্ম উপস্থিতি, নারীত্বের উর্ধ্বে সতীত্বের স্থান, জীবনমুখী শিক্ষার অনুপস্থিতি মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে নরনারীর সম্পর্ক অনেকাংশেই ছিল বহিরঙ্গ নির্ভর। বিবাহ বন্ধনও দাম্পত্য জীবন নির্ভর হওয়ার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রেই হয়েছে পারিবারিক মেল-বন্ধনের মাধ্যম। বস্তুত নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থবিকাশের অনুকূল পরিবেশ সে যুগে গড়ে ওঠেনি। প্রণয় যেমন দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি, তেমনি আবার বিচিত্র জটিলতা ও সংঘাতের আকর। বাল্য বিবাহের ফলে তখন - পূর্বরাগ যেমন সম্ভব ছিল না, বহুবিবাহের ফলে বিবাহোত্তর প্রেমেরও সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব ছিল না। বলাই বাহুল্য যে মধ্যযুগের পুরুষ-কেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে সতীদাহ প্রথা, কৌলীণ্যপ্রথা, গৌরীদান প্রথা - এসবই নরনারীর

প্রেমের সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী ছিল। তাছাড়া তদানীন্তন সামাজিক রীতি অনুযায়ী দিবালোকে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হওয়াটা ছিল অস্বাভাবিক। ফলে নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক ঐ সমাজে গড়ে উঠতে পারেনি। আচার সর্বস্ব ধর্মনীতির নিয়ন্তা পুরুষরা নারীকে তাদের সমকক্ষ ভাবা তো দূরের কথা, এমনকি মানুষের মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠিত ছিল। তাই "স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের সবদিক মিলাইয়া সমন্বয় করিয়া একীভূত একটা সম্পর্ক কখনই গড়িয়া উঠে নাই।" [৩৭] ঐহিকতা বিমুখ মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শ তাই উপন্যাসের আশ্রয়ভূমি হ'তে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙালি সমাজে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের দ্বারা চালিত হয়েই নব্যবঙ্গীয়েরা এই পরিবর্তন আনয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। বিভিন্ন 'সমাজ-হিতৈষী কর্ম প্রচেষ্টা'র মাধ্যমে এদেশের সমাজ থেকে অপসারিত হতে থাকে মধ্য যুগের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা। এর ফলে মানুষের মনে জেগেছে অপসারিত হতে থাকে মধ্যযুগের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা। এর ফলে মানুষের মনে জেগেছে মর্তবাসী মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি ঔৎসুক্য। এই পরিবর্তন আনয়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার বিদ্যা। শুধু নবার্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যালয়, কালপ্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যাও সমাজে নূতন করে শ্রদ্ধা মিশ্রিত স্থান পায়। এর ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে দেখা দেয় নবচেতনা, নবজিজ্ঞাসা। সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদি প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। সমাজে নাড়া পড়ে।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারীর প্রতি মমত্ববোধ। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশীয় সংস্কারকদের কাছে স্বদেশীয় নারীর অসহায়, লাঞ্ছিতরূপ ধরা পড়েছিল। নারীকল্যাণকল্পে তাদের প্রয়াস সতীদাহ নিবারণে, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে, কৌলীণ্য প্রথার বিরুদ্ধে, স্ত্রী শিক্ষার প্রয়াসে প্রকাশিত। যদিও নারীকল্যাণের এই প্রচেষ্টা উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও উল্লেখযোগ্য এই নবোদিত সমাজ-চেতনা সমাজের বুকে জাগিয়েছে চাঞ্চল্য। উনিশ শতকের বাংলা এই সমস্ত ঘটনার ভীড়ে

ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তমান। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটে। নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে নরনারীর সুস্থ দাম্পত্য জীবনবোধ প্রকাশের অবকাশ পায়। উপন্যাসের উপাদান হিসেবে প্রণয় বিকশিত হতে আরম্ভ করে সমাজে। সময় ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তিসত্তা মথিত হয় আত্মপরিচয় সন্ধানের ব্যগ্রতায়। শুরু হয় নূতন পথের সন্ধান ও নূতন পাথেয় নির্মাণের প্রচেষ্টা। কিন্তু এই সন্ধান ও নির্মাণ সত্ত্বেও পরিণতিতে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, কেননা উপন্যাসের আশ্রয়ভূমি সবে তখন তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। আরম্ভ হয়েছে উপন্যাসের উপযোগী সমাজ-মনন। তার সংহত রূপ লক্ষ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রে। এই সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য আমরা প্রাক-বঙ্কিমপর্বের রচনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব লগ্ন থেকে বঙ্কিমের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', হানা ক্যাথেরীণ ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' বিচিত্র স্বাদী গ্রন্থ। এদের মধ্যে হানা ক্যাথেরীণ ম্যুলেন্স ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিলে বাকি গ্রন্থগুলোতে সমকালীন যুগের বাবু ও বাবু সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের নোংরামি, ভণ্ডামি, আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন লেখক। সমসাময়িক যুগের মূল্যবোধ এবং সমাজের ছবি গ্রন্থগুলোতে নিহিত রয়েছে। কিন্তু নরনারীর মানবিক সত্তা ও অন্তরঙ্গ বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়নি।

বস্তুত উপন্যাসের উদ্ভব লগ্নে গল্প শোনার আগ্রহই ছিল প্রবল। গল্পের আকর্ষণ মুখ্য হওয়ার জন্য সূচনাপূর্বে লেখককে একাধিক কাহিনীর সন্ধান করতে হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে শাখাকাহিনী বা উপকাহিনীকে সুকৌশলে পরিবেশন করে পাঠকের কৌতূহলকে

ধরে রাখতে হয়েছে। গল্পপ্রিয় পাঠকের কৌতূহলকে জাগ্রত রাখার অভিপ্রায়েই উপন্যাসের উদ্ভবলগ্নে জটিল প্লট গ্রন্থন লক্ষণীয়। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ভিন্ন অন্যান্য রচনাগুলোতে প্রধাণত প্রাচীন ধারাবাহিক বর্ণনারীতি অনুসৃত হয়েছে।

প্রাক্-বঙ্কিমপর্বের সাহিত্যিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হানাক্যাথেরীন ম্যালেন্স প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ তদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ভিত গড়তে সাহায্য করেছেন। তাদের কেউ কেউ সচেতন ভাবে পথের সন্ধানী, আবার কেউ কেউ অনির্দিষ্ট যাত্রা শুরু করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য কাহিনীর উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা কিছু নীতিকথাও বলেছেন। অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্ম ও নীতিপ্রচারে সরাসরি উদ্যোগী হ'লেও ম্যালেন্সের রচনায় দেশীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর খ্রীষ্টানদের জীবনকথার পরিচয় আছে। লালবিহারীর রচনায় তেমনি গার্হস্থ্য জীবনের ছবি লক্ষণীয়। ইতিহাস ও কল্পনা মিশিয়ে কৃষ্ণকমল ও ভূদেব বাস্তবজীবন থেকে দূরে স্থাপিত কল্পনাশ্রয়ী বর্ণাঢ্য কাহিনী রচনা করেছেন। এঁরা পুরাতন নরনারীতে আধুনিক মানবসত্য আবিষ্কার করলেন।[৩৮] এভাবেই ক্রমশঃ বঙ্কিমের আবির্ভাবের ভূমিকা তৈরি হলো। সাহিত্যকে সমকালীন ও চিরকালীন করে তোলার প্রচেষ্টা সার্থক হ'লো।

তবুও প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের স্রষ্টা হিসেবে, সাহিত্যকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে এঁদের অবদান অসামান্য। তাছাড়া কোন পথে সাহিত্যে বাস্তবতার যাত্রাভেদ স্বীকৃত হ'লো, সাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে বাস্তবতার নূতন সংজ্ঞা ও চরিত্র আত্মীকৃত হ'লো এই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের জন্যে প্রাক্-বঙ্কিমপর্বের লেখকদের রচনা আমাদের নিবিষ্ট পাঠ দাবি করে।

উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। সবারই অভিমত মধ্যযুগের অবসান আর বুর্জোয়া যুগের সূচনা - এই হ'লো উপন্যাসের জন্মকাল।

মধ্যবিত্তের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাস জন্মসূত্রে জড়ানো। উপন্যাসকে বুঝতে হ'লে এর উদ্ভবের সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় জানতেই হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার সামাজিক ইতিহাসের একটা বিশেষ লগ্নে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মসচেতনতা একটা বিশেষ স্তরে পৌছায়। আত্মপ্রতিকৃতি দেখাটা তখন তাঁদের জরুরী হয়ে ওঠে। শুধু ইতিহাস বা সংবাদ-পত্রে নয়, জীবনচরিত, ভ্রমণকথা - নানা ক্ষেত্রে, নানা ভাবে তাঁরা আত্ম প্রতিকৃতি সন্ধানে তখন সচেষ্ট। চাহিদা এলো তাই শিল্পের আয়নায় আত্ম প্রতিকৃতি দেখার। এই শিল্পমুকুরে তাঁদের নিজের প্রতিকৃতি দেখার জরুরী চাহিদা থেকেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয়। ঔপন্যাসিকের মন সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ নয়। ঔপন্যাসিক ভবিষ্যৎকে, অনাগতকে প্রত্যক্ষ করেন। ঔপন্যাসিক তাই অনাগত বিধাতা। সূক্ষ্ম অর্থে বিপ্লবী। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা লক্ষ করি এই বিপ্লব।

সংস্কারের বেড়াজালে, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে পুরুষ ও সমাজের নির্দেশকেই অমোঘ নীতি বলে মেনে নিতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে সেই নারীর ব্যক্তিসত্তার উত্তরণ ঘটে। তাই তো স্ত্রী হয়েও ভ্রমর স্বামীকে বলেছেন —

> যতদিন তুমি আমার ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতোদিন তুমি আমার বিশ্বাসের যোগ্য, ততোদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমাতে আমার সেই ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।[৩১]

নারীর এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি, নারীর এই অকুণ্ঠ ঘোষণা, নারী ব্যক্তিত্বের এই সুস্পষ্ট আত্ম-প্রকাশ বঙ্কিমের আগে আর কোন কাহিনীকারের মধ্যে আমরা পাইনা। মধ্যযুগে তো নয়ই। কেননা তখনকার সমাজপ্রেক্ষিতই ছিল এর অন্তরায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও নবজাগরণের আলোকে নারী তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। তাই প্রাক্ বঙ্কিমপর্বে ধীরে ধীরে উপন্যাসের ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময়কার সমাজতাত্ত্বিক বনিয়াদ এই জিজ্ঞাসায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্রনির্দেশ

১. ক্ষেত্রগুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, (তারিখ উল্লেখ নেই), পৃ.৩

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ.১

৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.১

৪. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : উপন্যাস প্রসঙ্গে, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ.৪০

৫. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.১

৬. তদেব, পৃ.৪০

৭. তদেব, পৃ.৫৬-৫৭

৮. তদেব, পৃ.১৪৬

৯. তদেব, পৃ.১৫৯

১০. হীরেন চট্টোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ.১৫৭

১১. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

১২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

১৩. রবীন্দ্রনাথ : চোখের বালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫১, ভূমিকা

১৪. The Novel is to me the most difficult work of all, as it it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea.

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী(English works) : সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ.১৭১

১৫. চন্দ্রনাথ বসু : নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কাঁটালপাড়া, ৭ম বর্ষ, ১২৮৭ বঙ্গ, পৃ.৩০

১৬. ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

১৭. ই. এম ফরস্টার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ মিলিয়ে উপন্যাসের মোট সাতটি অপরিহার্য লক্ষণ বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হ'লো - Story, people, plot, Fantacy, prophency, pattern and Rhythm তবে মোটের ওপর তিনি বহিরঙ্গ লক্ষণের প্রতিই জোর দিয়েছেন। তাই তাঁর মতে Fantacy, Prophecy, pattern, Rhythm উপন্যাসের প্রধান বিষয় নয়।

(E.M. Forster : Aspects of the novel; Penguin Books, New York, 1982)

১৮. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯

১৯. Edwin Muir : The Structure of the Novel; B.T. Publications, Delhi; 1979.

২০. ক্ষেত্রগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ.১৯-২১

২১. জয়ন্তকুমার ঘোষাল : বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ.৩

২২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ.৮৩-৮৪

২৩. কার্তিক লাহিড়ী : বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৪ পৃ.৪

২৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ.৬৪

২৫. তদেব, পৃ.২৩

২৬. কমলকুমার সান্যাল : উপন্যাসবীক্ষা, বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.১৩

২৭. তদেব, পৃ.১৩

২৮. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

২৯. কমলকুমার সান্যাল : প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

৩০. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড, বঙ্কিমপূর্ব যুগ), গ্রন্থ প্রকাশ, ১৩৭১, পৃ.১২

৩১. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : প্রাগুক্ত, পৃ.১৬-১৭

৩২. বিনয় ঘোষ : শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, সিগনেট বুকশপ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ.১১৮

৩৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

৩৪. Henry Fielding, Middleton Murry, Buffon, Abrams, Miriam, Allott - থেকে David Lodge পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

৩৫. কোন শ্রেণীর উপন্যাসে কোন বিশেষ রীতি অনুসৃত হবে - এ সম্পর্কে সমালোচকদের কোন অনিবার্য বিধান বেঁধে দেওয়া নেই।

৩৬. শিশির চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ কাল ১৯৫২, পৃ.২৯

৩৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী , মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ.৬৩

৩৮. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

৩৯. বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খন্ড), সাহিত্য সংসদ , কলকাতা, ১৩৮৪ পৃ.৫৭২